মুহাম্মাদ- ﷺ -শেষ নবী

محمد ﷺ خاتم النبيين – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

محمد ﷺ خاتم النبيين

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة السادسة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤١٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)

محمد ﷺ خاتم النبيين / شعبة توعية الجاليات بالزلفي ١٤١٧

٥٧ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٧-٣٤- ٨١٣-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-السيرة النبوية أ. العنوان

ديوي ٢٣٩ ١٤١٧/٣١٣٣

رقم الإيداع : ١٤١٧/٣١٣٣

ردمك : ٧-٣٤- ٨١٣-٩٩٦٠

محمد-ﷺ-خاتم النبيين

মুহাম্মাদ-ﷺ-শেষ নবী

নবী আসার পূর্বে আরবের অবস্থা

মূর্তি পূজাই ছিলো আরবদের প্রচলিত ধর্ম। সত্য ধর্মের পরিপন্থী এই মূর্তিপূজাবাদ অবলম্বন করার কারণে তাদের এ যুগকে জাহেলিয়াত তথা মূর্খতার যুগ বলা হয়। লাত, উযযা, মানাত ও হুবল ছিলো তাদের প্রসিদ্ধ উপাস্যগুলোর অন্যতম। আরবের কিছু লোক ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নি পূজকদের ধর্মও গ্রহণ করেছিলো। আবার স্বল্প সংখ্যক লোক এমনও ছিলো, যারা ইব্রাহীম-عليه السلام-এর প্রদর্শিত পথে ছিলো অবিচল, আঁকড়ে ধরেছিলো তাঁর আদর্শকে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেদুঈনরা সম্পূর্ণ ভাবে চরে খাওয়া পশু সম্পদের উপর নির্ভর করতো। আর নগরবাসীদের নিকট অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিলো কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। ইসলামের আসার পূর্বে আরব উপত্যাকা মক্কা ছিলো বৃহত্তর বাণিজ্য নগরী। অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলেও উন্নয়ন ও স্থাপত্য সভ্যতা ছিলো। সামাজিক দিক দিয়ে যুলুম ব্যাপক আকারে বিদ্যমান ছিলো। সেখানে তাদের মধ্যে যারা দুর্বল হতো, তাদের কোনো অধিকার থাকত না। কন্যা সন্তানকে জীবদ্দশায় দাফন করা হতো। মান-ইজ্জত ও সম্মানকে পদদলিত করা হত। সবলরা দুর্বলের অধিকার হরণ করতো। বহুবিবাহ প্রথার

কোনো সীমা ছিল না। ব্যভিচার অবাধ ভাবে চলতো। নগণ্য ও তুচ্ছ কারণে যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠতো। এমন কি একই গোত্রের মধ্যেও পারস্পপরিক লড়াই চলতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে, ইসলাম আসার পূর্বে আরব দ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতি অত্যধিক ভয়াবহই ছিলো।

ইবনুযযাবিহাঈন

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিবের সাথে কুরাইশরা ছেলে-সন্তান ও ধন-সম্পদের গৌরব ও অহঙ্কার প্রদর্শন করতো। তাই তিনি মানত করলেন যে, আল্লাহ যদি তাঁকে দশজন ছেলে দান করেন, তাহলে তিনি একজনকে কথিত মা'বূদের নৈকট্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে জবাই করবেন। তাঁর সাধ বাস্তব রূপ পেলো। দশজন ছেলে জুটলো তাঁর ভাগ্যে। তাদের একজন ছিলেন নবী করীম-ﷺ-এর পিতা আব্দুল্লাহ। আব্দুল মুত্ত্বালিব মানত পূরণ করার ইচ্ছায় সন্তানদের মধ্যে লটারী করলে তাতে আব্দুল্লাহর নাম বের হলো। তিনি (তাকে জবাই ক'রে) মানত পূরণ করতে চাইলে লোকজন তাঁকে বাধা দিলো, যাতে এটা মানুষের মধ্যে প্রথা না হয়ে যায়। অতঃপর সবাই আব্দুল্লাহ এবং দশটি উটের মধ্যে লটারী করতে সম্মত হলো। কিন্তু লটারীতে আব্দুল্লাহর নাম আসলো, ফলে উটের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হলো। এইভাবে লটারী বারংবার আব্দুল্লাহর নামে আসতে থাকলো। দশমবারে লটারী

উটের নামে আসল যখন তার সংখ্যা ১০০তে পৌঁছে গেছিলো। ফলে তিনি তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহর পরিবর্তে (১০০টি) উট জবাই করলেন।

আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল মুত্ত্বালিবের সবার চাইতে প্রিয় ছেলে ছিলেন।

বিশেষতঃ এই ঘটনার পর। আব্দুল্লাহ তারুণ্যের সীমায় পা রাখলেন, তাঁর পিতা বনী যোহরা গোত্রের আমেনা বিনতে ওয়াহাব নামক এক তরুণীর সাথে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। আমেনা অন্তঃসত্ত্বা হলেন। তাঁর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার তিন মাস পর আব্দুল্লাহ এক বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রোগাক্রান্ত হয়ে মদীনায় বনীনাজ্জার গোত্রেতাঁর মামাদের কাছে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

এদিকে গর্ভের মাসগুলো পুরো হয়ে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসল এবং সোমবারের দিন নবী করীম-ﷺ-জন্মগ্রহণ করলেন। তবে তাঁর জন্মের তারীখ ও মাস নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট করা যায়নি। তাই কেউ বলেছে, তিনি ৯ই রাবিউল আওয়াল জন্ম গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেছে, ১২ই রাবিউল আওয়াল এবং কেউ বলেছে, রমযান মাসে। এ ছাড়া আরো উক্তিও আছে। আর এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় ইংরাজী সনের ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছরটা 'আমুল ফীল' (হস্তি বাহিনীর বছর) নামে পরিচিত।

হস্তী বাহিনীর ঘটনা

আবরাহা ছিল ইথিওপিয়ার শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের গভর্নর। সে যখন দেখলো যে, আরবরা মক্কায় অবস্থিত কা'বার হজ্জ করে, তার সম্মান করে এবং দূর-দুরান্ত থেকে সেখানে আগমন করে, সে তখন সানআ'তে (ইয়ামানের বর্তমান রাজ- ধানী) এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করল, যাতে আরবরা (মক্কায় না গিয়ে) এ নব নির্মিত গির্জার হজ্জ করে। অতঃপর কেনানা গোত্রের (আরবের একটা গোত্র) এক লোক তা শুনার পর রাতে প্রবেশ ক'রে গির্জার দেয়ালগুলোকে মলদ্বারা পঙ্কিল করে দেয়। আবরাহা এ কথা শুনার পর রাগে ক্ষেপে উঠে এবং ৬০ হাজারের এক বিরাট সেনা বাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফ ধ্বংস করার জন্য রওয়ানা হয়, সেনাবাহিনীর মধ্যে নয়টি হাতী ছিলো। সে নিজের জন্য সব চেয়ে বড় হাতীটা পছন্দ করলো। মক্কা নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত তারা যাত্রা অব্যাহত রাখল। তারপর সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত ক'রে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য উদ্যত হলো, কিন্তু হাতী বসে গেলো কোনোক্রমেই কা'বার দিকে অগ্রসর করানো গেলো না। যখন তারা হাতীকে কা'বার বিপরীত দিকে অগ্রসর করাত, তখন দ্রুত সে দিকে অগ্রসর হতো, কিন্তু কা'বার দিকে অগ্রসর করাতে চাইলেই, বসে পড়তো। ঠিক এই মুহূর্তে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রেরণ করেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যা তাদের উপর জাহান্নামের আগুনে পক্ক করা ছোট ছোট পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করা শুরু করোল। প্রত্যেক পাখি

তিনটি করে কাঁকর বহন করে এনেছিলো। ১টি পাথর ঠোঁটে আর দুটি দুই পায়ে। পাথর দেহে পড়া মাত্র দেহের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছিলো। যারা পলায়ন করেছির, তারাও পথে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি।

আর আবরাহার উপর মহান আল্লাহ এমন মারাত্মক এক রোগ প্রেরণ করলেন, যে রোগের ফলে তার সব আঙ্গুল খসে পড়তে লাগলো এবং সে এমন অবস্থায় সানআ'য় পৌঁছলো যে, কষ্ট তার শেষ সীমা পর্যন্ত তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সে সেখানে মৃত্যুবরণ করলো। কুরাইশরা গিরি উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেনাবাহিনীর ভয়ে পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। আবরাহার সেনাবাহিনীর এ অশুভ পরিণামের পর তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে আসলো। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর জন্মের ৫০দিন পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

দুধ পান

নবী করীম-ﷺ-এর জন্মের পর প্রথমে তাঁকে দুধ পান করায় তাঁর চাচা আবূ লাহাবের ক্রীতদাসী সুআইবা। এই মহিলা ইতিপূর্বে তাঁর (রাসূলের) চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকেও দুধ পান করিয়ে ছিলো। তাই হামযা-رضي الله عنه-ছিলেন নবী করীম-ﷺ-এর দুধ ভাই। আরবদের প্রথা ছিলো যে, তারা তাদের শিশুদেরকে বেদুঈন অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে লালন-পালন করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিতো। সেখানে তাদের

দৈহিক সুস্থতার অনুকূল পরিবেশ ছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ও অন্য দুধদাত্রীর কাছে স্থানান্তরিত হলেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর যখন জন্ম গ্রহণ করলেন, এ সময় বনীসাদ গোত্রের মহিলাদের একটি দল এমন সন্তানের খোঁজে মক্কায় আসলো, যাদেরেক তারা দুধপান করাবে। মহিলারা মক্কার ঘরে ঘরে শিশুর অনুসন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর পিতৃহীনতা ও দারিদ্র্যের কারণে সকল মহিলারা মুহাম্মাদ-ﷺ-কে গ্রহণ করা থেকে বিমুখ ছিলো। হালিমা সাদিয়াও ছিলেন বিমুখ প্রদর্শনকারিণী মহিলাদের মধ্যে একজন। সবার মত তিনিও ছিলেন বিমুখ। শিশু পালনের পারিশ্রমিক দিয়ে জীবনের অভাব অনটন বিমোচন করা ও জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দূর করার লক্ষ্যে মক্কার অধিকাংশ ঘরে শিশুর অনুসন্ধান করেও সফল হোননি তিনি। এ দিকে সে বছরে ছিল অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ। তাই স্বল্প পারিশ্রমিকেই ইয়াতীম সন্তানকে নেয়ার উদ্দেশ্যে আমেনার ঘরে আবার ফিরে আসেন তিনি। হালিমা আপন স্বামীর সাথে মক্কায় মন্থর গতিতে চলে এমন একটি দুর্বল গাধী নিয়ে এসে-ছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে কোলে নেয়ার পর গাধী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিল এবং অন্যান্য সব জানো- য়ারকে পিছনে ফেলে আসছিল। ফলে সফর সঙ্গীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। হালিমা আরো বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্তনে কোনো দুধ ছিল না, তাঁর ছেলে ক্ষুধায় সর্বদা কাঁদতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন তাঁর পবিত্র

মুখ স্তনে রাখেন, তখন থেকেই প্রচুর পরিমাণে দুধ তাঁর স্তনে আসতে লাগে। বনী সাদ গোত্রের অধ্যুষিত অঞ্চলের অনাবৃষ্টি সর্ম্পকে তিনি বলেন যে, এ শিশু (মুহাম্মদ-ﷺ-) দুধ পান করার বদৌলতে জমিতে উৎপন্ন হতে লাগল ফল-মূল এবং ছাগল ও অন্যান্য পশু দিতে লাগল বাচ্চা। অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের পরিবর্তে সুখ ও সমৃদ্ধি সর্বত্র বিস্তার লাভ করে।

মুহাম্মাদ-ﷺ-হালিমার পরিচর্যায় দু'বছর লালিত পালিত হোন। তিনি তাঁর প্রতি সর্বতোভাবে যত্নশীলা ছিলেন। এই শিশুকে কেন্দ্র করে হৃদয়ের গভীরে তিনি বহু অলৌকিক কর্ম-কান্ড ও অবস্থা উপলব্ধি করতেন। দু'বছর শেষ হবার পর হালিমা তাঁকে মক্কায় তাঁর মাতা ও দাদার কাছে নিয়ে আসলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বদৌলতে বহু এমন বরকত অবলোকন করেন, যে বরকত তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তাই আমেনার কাছে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে দ্বিতীয়বার দেয়ার জন্য আবেদন করেন। আমেনা তাতে সম্মত হোন। হালিমা ইয়াতীম শিশুকে নিয়ে নিজ এলাকায় আনন্দ ও সন্তোষ সহকারে ফিরে আসেন।

বক্ষ বিদারণ

এক দিন শিশু মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর দুধভাইয়ের সাথে তাঁবু থেকে দূরে খেলা-ধুলা করছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিলো চার বছরের কাছা কাছি। হালিমার ছেলে ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে মায়ের কাছে

দৌড়ে এসে তাকে কুরাইশ ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানাল। ঘটনা কি জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তর দিল যে, দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত লোককে আমাদের কাছ থেকে মুহাম্মাদকে নিয়ে মাটিতে চিত ক'রে ফেলে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করতে দেখেছি। তার বর্ণনা শেষ না করতেই হালিমা মুহাম্মদ-ﷺ-এর দিকে দৌড়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, মুহাম্মাদ নিজ স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। হলুদ বর্ণ মুখমন্ডলে ছেয়ে আছে এবং দেহ ফ্যাকাশে। তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অত্যন্ত শান্তভাবে জবাব দেন যে, তিনি ভালো আছেন। তিনি আর বললেন, সাদা পোশাক পরিহিত দু'ব্যক্তি এসে তাঁর বক্ষবির্দীণ করে, তারপর হৃদয় বের ক'রে কাল জমাট বাঁধা রক্ত বের ক'রে ফেলে দেয়। অতঃপর হৃদয়কে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দেয় এবং বক্ষে হাত ফিরিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। এর পর হালিমা মুহাম্মাদ-ﷺ-কে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসেন। পরের দিন ভোর হতেই তিনি মুহাম্মাদ-ﷺ-কে তাঁর মায়ের কাছে মক্কায় নিয়ে আসেন। আমেনা অনির্ধারিত সময়ে হালিমাকে ছেলে নিয়ে আসতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হোন, অথচ তিনি ছেলের (নিজের কাছে রাখার) প্রতি ছিলেন অত্যধিক আগ্রহী। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে হালিমা বক্ষ বিদারণের ঘটনার পুরো বিবরণ দেন।

আমেনা নিজের ইয়াতীম শিশু মুহাম্মাদ-ﷺ-কে নিয়ে ইয়াসরিবে (মদীনায়) বনী নাজ্জার গোত্রে মামাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার

জন্য যাত্রা করেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করেন। মক্কা ফেরার পথে "আবওয়া" নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়। এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ফলে মুহাম্মাদ-ﷺ-ছয় বছর বয়সে মাতৃ-স্নেহ ও তাঁর আদরের ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যান। দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে এ অপূরণীয় ক্ষতির কিছুটা লাঘব করতে হয়। তাই তিনি তাঁর দেখা-শুনা ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন আট বছর বয়সে পা রাখেন, তখন তাঁর দাদাও ইহ- কাল ত্যাগ করেন। অতঃপর চাচা আবূ ত্বালিব আর্থিক অভাব-অনটন ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দেখা-শুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর চাচা আবূ ত্বালিব ও তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে আপন ছেলের ন্যায় আচরণ করেন। ইয়াতীম ছেলের সম্পর্ক আপন চাচার সাথে অনেকটা গভীর হয়ে উঠে। এ পরিবেশে তিনি বড় হয়ে উঠেন। সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর মত গুণে গুণান্বিত হয়ে যৌবনে পদার্পন করেন। এমন কি উক্ত গুণ দু'টি তাঁর পরিচায়ক উপাধিরূপে প্রসিদ্ধ লাভ করে। সুতরাং কেউ যদি বলতো, আল-আমীন উপস্থিত হয়েছেন, বুঝা হতো মুহাম্মাদ-ﷺ-।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে জীবিকার্জনের চেষ্টা করেন। ফলে শ্রম-সাধনা ও উপার্জনের পালা আরম্ভ হয়। তিনি স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরাইশের কিছু লোকের ছাগলের রাখাল হিসেবে কাজ করেন। খাদীজা বিনতে

খোয়াইলিদ কর্তৃক আয়োজিত এক বাণিজ্যিক ভ্রমণে সিরিয়া গমন করেন। খাদীজা ছিলেন বিত্তশালিনী এক বিধবা মহিলা। সে ভ্রমণে সম্পদ ও ব্যবসায়িক সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক ছিল তাঁরই দাস 'মাইসারাহ' রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বরকত ও সততার কারণে খাদীজার এ ব্যবসায়ে নজীরবিহীন লাভ হয়। তিনি স্বীয় দাস মাইসারাহর কাছে এত লাভ হওয়ার কারণ কি জানতে চাইলে বলা হয়, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিজেই বেচা-কেনার দায়িত্ব নিয়ে নেন। ক্রেতার ঢল নামে। ফলে কারো প্রতি কোনো যুলুম করা ব্যতিরেকেই লাভ হয় প্রচুর। খাদীজা তাঁর দাসের বর্ণনা মনোযোগ দিয়ে শুনেন। এমনিতেও তিনি মুহাম্মাদ-ﷺ-সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তিনি মুহাম্মাদের প্রতি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁকে বিবাহ করতে আগ্রহী হোন। তাই এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ-ﷺ-এর মনোভাব জানার উদ্দেশ্যে নিজের এক আত্মীয়াকে পাঠান। তখন তাঁর বয়স পঁচিশে উন্নীত হয়েছিল। তাঁর নিকট খাদীজার আত্মীয়া বিয়ের প্রস্তাব রাখলে তিনি তা গ্রহণ করেন। বিয়ে সম্পাদিত হয়। তাঁরা একে অপরকে পেয়ে সুখী হোন। তিনি খাদীজার অর্থ সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দেন। কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। খাদীজা গর্ভধারণ ও প্রসব করেন। ফলে খাদীজার গর্ভে জন্ম লাভ করেন, কন্যাদের মধ্যে যয়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মেকুলসুম ও ফাতিমা। আর ছেলেদের মধ্যে কাসিম ও আব্দুল্লাহ, যারা শৈশবেই মারা যান।

নবূওয়াত লাভ

তাঁর বয়স চল্লিশের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মক্কার সন্নিকটে পূর্বদিকে (নূর নামক) এক পাহাড়ের হেরা নামক গুহায় তিনি-ﷺ-নিরিবিলি ও নির্জন অবস্থায় কয়েক দিন ও কয়েক রাত আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়ে দিতেনপ। বিত্র রমযানের ২১তারিখের রাতে গুহায় তাঁর কাছে জিবরীল-আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। জিবরীল-عليه السلام-বললেন, পড়ুন। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরীল-عليه السلام-দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বারের মত পুনরায় বললেন। তৃতীয়বার জিবরীল -عليه السلام-বললেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾[العلق: ١-٥]

“তুমি পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। তুমি পড়ো। আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (আলাক১-৫) অতঃপর জিবরীল-عليه السلام-চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আর হেরা গুহায় অবস্থান করতে পারলেন না। তিনি ঘরে এসে খাদীজাকে হৃদয় স্পন্দিত অবস্থায় বললেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো। তাঁকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হলো। ভয় ও আতংক দূর হয়ে গেলে তিনি সবকিছু

খুলে বললেন। এর পর তিন বললেন, আমি নিজের ব্যাপারে আশংকা বোধ করছি। খাদীজা দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, অভাবীদের সাহায্য করেন, নিঃস্ব ব্যক্তিদেরকে প্রদান করেন। অতিথিকে সমাদর করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সহায়তা করেন।"

কিছু দিন পর তিনি-ﷺ-আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখার জন্য আবার হেরা গুহায় ফিরে আসেন। ইবাদত শেষে গুহা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তণের জন্য অবতনণ করছিলেন, যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন জিবরীল-عليه السلام-আকাশ ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর কাছে এসে তাঁর প্রতি আল্লাহর এই বার্তা পৌঁছে দেন,

﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قُمْ فَأَنْذِرْ* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ* وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدَّثر:١-٥]

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠো, সতর্ক করো, এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো, অপবিত্রতা বর্জন করো।" (সূরা মদ্দাসসির ১-৫) এরপর ওহী আসার পালা অব্যাহত থাকে।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর দাওয়াতী ব্রত শুরু করলে সর্ব প্রথম তাঁর গুণবতী স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঈমানের ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর মহান স্বামীর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেন। তাই তিনি

ছিলেন সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারিণী মুসলিম নারী। অতঃপর নবী করীম-ﷺ-তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবূ বাকার-رضي الله عنه-র সাথে ইসলামের ব্যাপারে আলাপ করলে দ্বিধাহীন চিত্তে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সত্যের সাক্ষ্য দেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আপন চাচা আবূ ত্বালিবের স্নেহ পরিচর্যা ও অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, যিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মাতা ও দাদার পর তাঁর দেখা-শুনার দায়িত্ব বহন করেছিলেন, তাঁর ছেলে আলীর লালন-পালন ও দেখা-শুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আর এ সুন্দর পরিবেশ আলীর অন্তর ও বিবেক খুলে দিয়েছিল। তাই তিনিও ঈমান আনয়ন করেন। অতঃপর খাদীজার দাস যাইদ ইবনে হারেসাহ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হোন।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-গোপনভাবে দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। নবাগত মুসলিমরা কুরাইশদের কঠিন নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয়ে তাঁদের ইসলাম গোপন করে রাখতেন। কারণ, তাদের মধ্যে কারো ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা প্রকাশ হয়ে গেলে, কুরাইশরা তাঁদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁদের উপর কঠিন নির্যাতন চলাতো।

প্রকাশ্য দাওয়াত

এ ভাবে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তিন বছর পর্যন্ত ব্যক্তিগত দাওয়াতের গোপন ব্রতে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে যে,

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر:٩٤]

"তুমি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দাও, যা তোমাকে আদেশ করা হয় এবং মুশ-রিকদের উপেক্ষা করো।" (সূরা হিজর ৯৪) এ আদেশ পেয়ে এক দিন তিনি সাফা পর্বতে আরোহণ ক'রে কুরাইশদেরকে ডাক দেন। তাঁর ডাক শুনে অনেক লোকের সমাগম ঘটে। তার মধ্যে তাঁর চাচা আবূ লাহাবও একজন ছিলো। সে কুরাইশদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সব চাইতে কট্টর শত্রু ছিল। মানুষ সমবেত হবার পর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, আমি যদি আপনাদেরকে এ কথার সংবাদ দেই যে, পাহাড়ের পেছনে এক শত্রুদল আপনাদের উপর আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন? সবাই এক স্বরে বলল, আমরা আপনার মধ্যে সততা ও সত্যবাদিতা ছাড়া কিছুই দেখিনি। তিনি বললেন, আমি আপনাদেরকে কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন এবং মূর্তিপূজা বর্জন করতে বললেন। এ কথা শুনে আবূ লাহাব রাগে ক্ষেপে উঠে বললো, তোমার ধ্বংস হোক। এ জন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছো? এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ এমন একটি সূরা অবর্তীণ করলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত তেলাঅত করা হবে। আর সেই সূরাটি হলো সূরা 'মাসাদ'।

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ [المسد ١-٥]

“আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো উপকারে আসবে না। অচিরেই সে শিখাবিশিষ্ট (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করবে। এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহনকারিণী। তার গলদেশে খেজুর আঁশের পাকানো রশি।” (সূরা মাসাদ ১-৫)

নবী করীম-ﷺ-তাঁর দাওয়াতী কাজ পুরো দমে অব্যাহত রাখলেন। জন সমাবেশ। স্থলে তিনি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে লাগলেন। তিনি কা’বা শরীফের নিকটে নামায আদায় করতেন। মানুষের সমাবেশে তিনি উপস্থিত হতেন। বাজারে মুশরিকদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। এ কারণে তিনি বহু কষ্টের শিকার হতেন। অনুরূপ যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করত, তার উপরে কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে যেতো। ইয়াসের, সুমাইয়্যা ও তাদের সন্তান আম্মারের বেলায় তাই ঘটেছে। তাদের নির্যাতনে আম্মারের পিতা-মাতা শহীদ হোন। সুমাইয়্যা ইসলামে প্রথম শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হোন। বিলাল ইবনে রাবাহ আল-হাবাশী-ﷺ-উমাইয়া ইবনে খালাফ ও আবূ জেহেলের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হোন। বিলাল-ﷺ-আবূ বাকার-ﷺ-র মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ খবর শুনে তাঁর মুনিব উমাইয়া ইবনে খালাফ অত্যাচা- রের সব রকম পন্থা অবলম্বন করে, যাতে বিলাল ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু তিনি আকঁড়ে ধরেন ইসলামকে এবং অস্বীকার করেন ইসলাম ত্যাগ করতে। উমাইয়া তাঁকে শিকলে বেঁধে মক্কার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুকের উপর

বিরাট পাথর রেখে উত্তপ্ত বালিতে হেঁচড়াইয়া টানত। অতঃপর সে ও তার সঙ্গীরা বেত্রাঘাত করত, আর বিলাল-ﷺ-শুধু আহাদ, আহাদ, বলতে থাকতেন। এহেন অবস্থায় (কোনো এক সময়) আবূ বাকর-ﷺ-যখন সেদিক দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন তাঁকে দেখতে পান। তিনি তখন বিলাল-ﷺ-কে উমাইয়্যার কাছ থেকে ক্রয় ক'রে আল্লাহর নিমিত্তে স্বাধীন করে দেন।

এ সব পৈশাচিক ও বর্বর অত্যাচারের কারণে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কৌশল অবলম্বন ক'রে মুসলিমদেরকে তাদের ইসলাম গ্রণের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। তাদের সাথে মিলিত হতেন অত্যন্ত সংগোপনে। কেননা, প্রকাশ্যভাবে মিলিত হলে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর শিক্ষা প্রদানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। তাছাড়া দু'দলের মাঝে সংঘর্ষের আশঙ্কাও ছিলো। আর এ কথা সুবিদিত যে, এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ মুসলিমদের ধ্বংস ও সমূলে বিনাশই ডেকে আনবে। কারণ মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তি-সামর্থ্য ছিল খুবই স্বল্প। তাই তাদের ইসলাম গোপন রাখাটাই ছিল দূরদর্শিতা। অবশ্য রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কাফেরদের অত্যাচার সত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত ও ইবাদতের কাজ করে যেতেন।

হাবশায় হিজরাত

যাঁর ইসলামের কথা ফাঁস হয়ে যেতো, তিনি মুশরিকদের নিপীড়নের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতেন। বিশেষতঃ দুর্বল মুসলিমরা। তাই তাঁরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট নিজেদের দ্বীন সহ হাবশায় হিজরত

করার অনুমতি চাইলেন। সেখানে তাঁদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছিল। অনেক মুসলিম নিজের জান ও পরিবার বর্গের উপর কুরাইশদের যুলুমের ভয় করছিলেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। নবূওয়াতের ৫ম বছরে প্রায় ৭০জন মুসলিম সপরিবারে হিজরত করেন। তাঁদের মধ্যে উসমান ইবনে আফফান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। এ দিকে কুরাইশরা ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের অবস্থান ব্যাহত করার চেষ্টা করে। সে দেশের রাজার জন্য পাঠায় উপঢৌকন। মুহাজিরদের তাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানায়। তারা তাঁকে (রাজাকে) এ কথাও বলে যে, মুসলিমরা ঈসা-عليه السلام-ও মারয়াম সম্পর্কে অপমানকর ও অশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে। নাজ্জাশী তাদেরকে ঈসা-عليه السلام-সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে কুরআন ঈসা-عليه السلام-সম্পর্কে যা বলেছে, তা পরিষ্কার ক'রে বলে দিয়ে সত্যটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। তাঁর সামনে সূরা মারিয়ামের তেলাঅত করেন। ফলে তিনি তাঁদেরকে নিরাপত্তা দান করেন এবং তাঁদেরকে কুরাইশদের হাতে সমর্পন করতে অস্বীকার করেন।

সে বছরের রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-হারাম শরীফে মানুষের কাছে যান। তিনি দাঁড়িয়ে তাদের সামনে সূরা 'নাজম'-এর তেলাঅত করতে লাগেন। সেখানে কুরাইশদের এক বিরাট দল ছিলো। এ সব কাফেররা ইতিপূর্বে কখনো আল্লাহর বাণী শুনেনি ছিল। কেননা তারা নবী করীম-ﷺ-এর কাছ থেক কিছুই না শুনার পদ্ধতি অনুসরণ করতো।

অকস্মাৎ তেলাঅতের মধুর ধ্বনি তাদের কর্ণে গেলে তারা আল্লাহর হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক বাণী ও সাবলীল ভাষা একাগ্রচিত্তে শুনে। সে সময় তাদের অন্তরে তা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ-ﷺ- ﴿فَاسْجُدُوا لله واعْبُدُوا﴾ আয়াতটি পড়ে সাজদায় চলে যান। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তারাও সাজদায় চলে যায়।

কুরাইশরা দাওয়াত দমন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে শাস্তি, নির্যাতন, নিপীড়ন, প্রলোভন ও হুমকি প্রদর্শনের মত সর্ব প্রকার পন্থা গ্রহণ করে। কিন্তু এসব কু-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা মুসলিমদের ঈমান বৃদ্ধি ও দ্বীন ইসলামকে অধিকতর আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। তাই এবার নতুন দুরভিসন্ধি ও মন্দ অভিপ্রায় তাদের অন্তরে জন্ম নিল। আর তা হলো, মুসলিম ও বনী হাশেমকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন ও একঘরে করে রাখার পরিকল্পনা। তাই এক চুক্তি- নামা লিখে সবাই তাতে স্বাক্ষর করে কাবাশরীফের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দেয়। চুক্তি অনুসারে তাদের সাথে বেচা-কেননা, বিয়ে-শাদি, সাহায্য-সহযোগিতা ও লেনদেন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এ চুক্তির ফলে মুসলিমরা বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে (শে'বে আবি ত্বালিব নামক) এক উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁরা সেখানে অবর্ণনীয় ক্লেশ ও দুঃখের শিকার হোন। ক্ষুধা ও অর্ধাহারের বিষাক্ত ছোবল তাদেরকে গ্রাস করে। সচ্ছল ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা নিজেদের

সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেন। খাদীজা তাঁর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করে দেন। তাদের মধ্যে বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ লোকই মৃত্যুর প্রায়-দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যায়। কিন্তু তাঁরা ধৈর্য অবিচলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে একজনও পশ্চাদপদ হননি। অবরোধ একাধারে তিন বছর স্থায়ী থাকে। অতঃপর বানী হাশেমের সাথে আত্মীয়তা আছে এমন কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জনসমাবেশে চুক্তি ভঙ্গ করার কথা ঘোষণা করে। চুক্তির কাগজ বের করা হলে দেখা গেল যে, উইপোকা সেটা খেয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র কাগজের এক কোণ যেখানে "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" বাক্যটি ব্যতীত কোনো স্থানই অক্ষত ছিলো না। সংকটের অবসান হয়। আর মুসলিম ও বানী হাশেম মক্কায় ফিরে আসলেন। তবে কুরাইশরা মুসলিমদের দমন ও মুকাবিলায় সেই রকমেরই জঘন্য আচরণ অব্যাহত রাখে।

দুঃখের বছর

কঠিন রোগ ব্যাধি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর চাচা আবূ ত্বালিবের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে যায়। সে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে পড়ে। মুমূর্ষা-বস্থায় যখন সে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তার মাথার পার্শ্বে বসে মৃত্যুর পূর্বে তাকে কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু আবূ জেহেল সহ অসৎ সঙ্গীরা যারা তার পার্শ্বে ছিলো, তাকে বাধা দিয়ে বললো, শেষ মূহূর্তে পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করবে? আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে? শেষ

পর্যন্ত সে মুশরিক হয়েই মারা গেল। চাচার কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করার ফলেই নবী করীম-ﷺ-এর দুঃখ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আবূ ত্বালিবের মৃত্যুর প্রায় দু'মাস পরে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মৃত্যুবরণ করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-অত্যন্ত চিন্তিত হোন। তাঁর চাচা আবূ ত্বালিব এবং স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র মৃত্যুর পরে কুরাইশের ঔদ্ধত্য ও উপদ্রব আরো বেড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তায়েফে

কুরাইশের ধৃষ্টতা এবং মুসলিমদের প্রতি তাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের নীতি অব্যাহত থাকার পর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তায়েফ গমনের সিদ্ধান্ত নেন। হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন। তবে তায়েফ গমন সহজ ব্যাপার ছিল না। আকাশ চুম্বি উচুঁ উচুঁ পাহাড়ের কারণে পথ ছিল দুর্গম। তায়েফবাসীরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে সর্বাপেক্ষা মন্দ আচরণ করেছিল। তারা তাঁর (রাসূলের) কথা তো-শুনলোই না, বরং তাঁকে বিতাড়িত করেছিল এবং শিশু ও কিশোরদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিয়ছিল। তাই তারা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ ক'রে তাঁর গোড়ালীকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছিল। তিনি ভীষণ দুঃখিত হয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন। পথি মধ্যে জিবরীল পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাসহ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "আল্লাহ পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন।" পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতা বলেলন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি চান আমি তাদের উপর আখসাবাইন (মক্কাকে

ঘিরে রাখা দুই পাহাড়)কে তাদের উপর চেপে দিব। তিনি-ﷺ-বললেন, "বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো শরীক স্থাপন করবে না।" আর এটা ছিলো স্বীয় জাতির প্রতি তাঁর সীমহীন ধৈর্য এবং দয়ার দৃষ্টান্ত, অথচ তাদের পক্ষ হতে তিনি কঠিন কষ্টের শিকার হয়েছেন।

চন্দ্রের দু'টুকরো হওয়া

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে মুশরিকদের বহু দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব এও ছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট নবূওয়াতের সত্যতা সাব্যস্ত করার জন্য অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর দাবী করতো। আর এ রকম দাবী তারা কয়েকবার করেছে। একবার তারা চন্দ্রকে দু'টুকরো করার দাবী করল। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আল্লাহর কাছে এর জন্য দুআ করলে তাদেরকে চন্দ্র দু'টুকরো করে দেখানো হল। কুরাইশরা এ নিদর্শন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দেখল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। বরং তারা বললো, মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাদু করে দিয়েছ। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, আমাদেরকে যাদু করলেও সব মানুষকে তো আর যাদু করতে পারবে না। তাই বহিরাগত আগন্তুকদের অপেক্ষা কর। বিভিন্ন মুসাফির আসলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হল। তারা বলে, হ্যাঁ আমরাও দেখেছি। এত কিছুর পরও তারা নিজেদের কুফরীতে জেদ ধরে রয়ে গেলো।

ইসরা-মিরাজ

তায়েফবাসীদের রূঢ় ও অমানবিক আচরণের পর যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তায়েফ থেকে ফিরে এলেন এবং আবূ ত্বালিব ও খাদীজার মৃত্যু

সহ কুরাইশের অত্যাচার যখন বহু গুণে বেড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর অন্তরে একাধিক চিন্তা একত্রিত হলো। তাই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে শোকাহত ও দুঃখে কাতর নবীর সান্ত্বনা আসলো। কোনো এক রাতে যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-নিদ্রারত ছিলেন, জিবরীল-عليه السلام-বুরাক নিয়ে উপস্থিত। আর বুরাক হলো, ঘোড়া সদৃশ এক জন্তু যার দু'টি দ্রুতমান পাখা ছিলো এবং তার গতি ছিলো বিদ্যুতের ন্যায়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে তাতে আরোহণ করিয়ে জিবরীল-عليه السلام-তাকে ফিলিস্তীনে অবস্থিত বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথমে নিয়ে যান। অতঃপর সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত নিয়ে যান। এ ভ্রমণে তিনি প্রতিপালকের বড় বড় অনেক নিদর্শন পরিদর্শন করেন। আসমানেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়। তিনি সেই রাতেই তুষ্ট মন ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মক্কায় প্রত্যাগমন করেন। মিরাজ ঘটনা উল্লেখ ক'রে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الاسراء:١]

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতারাতি ভ্রমণ করিয়েছেন, (মক্কার) মাসজিদুল হারাম হতে (ফিলিস্তীনের) মাসজিদুল আক্বসায়, যার পরিবেশকে আমি করেছি বর্কতময়, যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাই। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (ইসরা ১)

ভোর বেলায় কাবাশরীফে গিয়ে লোকদেরকে তিনি তাঁর সাথে ঘটে যাওয়ার ঘটনার বিবরণ বিবরণ দেন। কাফেরদের তখন মিথ্যা অভিযোগ ও ঠাট্ট-বিদ্রূ আরো বেড়ে যায়। উপস্থিত কয়েকজন লোক তাঁকে বাইতুল

বায়কুল মুক্বাদ্দাসের বিবরণ দিতে বলে। মূলতঃ তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে অপারগ ও অক্ষম প্রমাণিত করা। তিনি তন্ন তন্ন করে সব কিছুর বিবরণ দিলেন। কাফেররা এতে ক্ষান্ত হল না, তাই তারা পলল, আমরা আর একটি প্রমাণ চাই। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, আমি পথে মক্কাগামী একটি কাফেলা দেখেছি এবং তাদেরকে কাফেলার বিস্তারিত বিবরণসহ উঁটের সংখ্যা ও আগমনের সময়ও বলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সত্যই বলেছেন, কিন্তু কাফেররা হঠকারিতা, কুফরী ও সত্যকে অস্বীকার করার দরুন উদভ্রান্ত রয়ে গেল। সকাল বেলায় জিবরীল-عليه السلام-এসে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পদ্ধতি ও সময়সূচী শিখিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে নামায কেবল সকাল বেলায় দু'রাকাআত ও বিকেল বেলায় দু'রাকয়াত ছিলো।

কুরাইশরা সত্যকে অস্বীকার করতে থাকায় এ দিনগুলোতে তিনি-ﷺ-মক্কায় আগমনকারী ব্যক্তিদের মাঝে দাওয়াতী তৎপরতা সীমিত রাখেন। তিনি তাদের অবস্থান স্থলে মিলিত হয়ে ইসলাম পেশ করতেন এবং তাদের সামনে তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। এদিকে তাঁর চাচা আবূ লাহাব তাঁর পিছনে লেগেই থাকত। সে লোকদেরকে তাঁর ও তাঁর দাওয়াত থেকে সতর্ক থাকতে বলত। একবার মদীনা থেকে আগত এক দলকে ইসলামের আহ্বান জানালে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনেন এবং তাঁর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ঐক্যবদ্ধ হোন। মদীনাবাসীরা ইয়াহুদীদের কাছে শুনতো যে, অদূর

ভবিষ্যতে এক নবী প্রেরিত হবেন। তাঁর আবির্ভাবের যুগ নিকটে এসে গেছে। তাঁদেরকে যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তিনিই হলেন সেই নবী, যাঁর কথা ইয়াহুদীরা বলেছে। তাঁরা সত্বর ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন এবং বলেন ইয়াহুদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হয়। তাঁরা ছিলন ছয়জন। পরবর্তী বছরে মদীনা থেকে বারজন আসেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেন। প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁদের সাথে তিনি মুসআব ইবনে উমাইর-رضي الله عنه-কে প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাদেরকে কুরআন ও দ্বীনের বিধানাবলী শিক্ষা দেন। মুসআব-رضي الله عنه-মদীনায় বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হোন। এক বছর পর তিনি যখন মক্কায় আসেন, তখন তাঁর সাথে ছিল ৭২জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁদের সাথে মিলিত হোন এবং তাঁরা দ্বীনের সহযোগিতা ও এর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অতঃপর তাঁরা মদীনায় ফিরে যান।

মদীনায় হিজরত

মদীনা সত্য ও সত্যের ধারকদের আশ্রয়ে পরিণত হয়। মুসলিমরা সেদিকে হিজরত করতে শুরু করেন। তবে কুরাইশরা মুসলিমদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলো। ফলে কোন কোন হিজরতকারীকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও

নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কুরাইশদের ভয়ে মুসলিমরা গোপনে হিজরত করতেন। আবূ বকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট হিজরত করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে বলেন, "তাড়াহুড়া করো না। আশা করি আল্লাহ তোমার জন্য একজন সঙ্গী নির্দ্ধারণ করবেন।" এইভাবে অধিকাংশ মুসলিমরা হিজরত ক'রে চলে গেলেন।

মুসলিমদের হিজরত করা এবং মদীনায় তাঁদের একত্রিত হওয়া দেখে কুরাইশরা প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়ল। মুহাম্মাদ-ﷺ-এর দাওয়াতের উন্নতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভয় ও আশঙ্কা বোধ করল। তাই তারা পরামর্শ করে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। আবূ জেহেল প্রস্তাব পেশ করলো যে, প্রত্যেক গোত্রের এক একজন নির্ভীক যুবককে তরবারী দেয়া হবে। এরা মুহাম্মাদকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং এক যোগে আক্রমণ ক'রে হত্যা করবে। ফলে তার খুনের অপরাধ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। এরপর বনীহাশেম সমস্ত গোত্রের সাথে লড়াই করার হিম্মত করবে না। আল্লাহ তাঁর নবীকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন। তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে আবূ বাকরের সাথে হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আলী-ﷺ-কে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন, যাতে লোকেরা মনে করে যে, রাসূল বাড়ীতেই আছেন।

ইতিমধ্যে কাফেররা বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে। বিছানায় আলীকে দেখে তারা নিশ্চিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বাড়ীতেই আছেন এবং হত্যা

করার জন্য তাঁর বের হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলো। এ দিকে মুহাম্মাদ-ﷺ-বের হয়ে সবার মাথার উপর বালু ছিটিয়ে দিলে আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন। ফলে তারা আঁচও করতে পারল না যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি আবূ বকর-ﷺ-কে সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁরা দু'জনেই "সওর নামক" এক গুহায় আত্মগোপন করেন। এ দিকে কুরাইশ যুবকেরা ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে। সকালে আলী-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বিছানা থেকে উঠলে তাদের হাতে পড়েন। তারা তাঁকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তাদেরকে কোনই খবর দিলেন না। ফলে তারা তাঁকে মার-ধর ও তাঁকে নিয়ে টানাটানি করে। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয়নি। অতঃপর কুরাইশরা চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দিলো এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-কে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারার জন্য ১০০টি উঁট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করলো। লোক-জন তাঁর অনুসন্ধানে সেই গুহার দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে নবী করীম-ﷺ-ও তাঁর সাথীকে নিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। এমন কি যদি তাদের কেউ তার নিজের পায়ের দিকে তাকাত, তাহলে তাঁদেরকে দেখে নিত। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর ব্যাপারে আবূ বাকার-ﷺ-র চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে যায়। তা দেখে তিনি-ﷺ-বললেন, "তুমি কি মনে করো আমরা দু'জন, বরং আমাদের সাথে তৃতীয়জন আল্লাহ আছেন। চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' অনুসন্ধানকারীরা তাদের সন্ধান পেলো না।

নবী করীম-ﷺ-তাঁর আবূ বাকার-رضي الله عنه-কে নিয়ে গুহায় তিন দিন অবস্থান করেন। তারপর মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথ ছিলো সুদীর্ঘ ও দুর্গম। সূর্যের তাপ ছিলো অতীব তিব্র। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় উম্মে মা'বাদ নামক এক মহিলার তাঁবুর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। তাঁরা তার কাছে খাবার ও পানি চাইলেন, কিন্তু তাঁর কাছে কিছুই পেলেন না। তবে একটি ছাগী দেখলেন। সে এত দুর্বল ছিলো যে, ঘাস খেতে যেতে পারেনি। আর এক ফোঁটা দুধও তার স্তনে ছিলো না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তার দিকে অগ্রসর হয়ে তার স্তনের উপর স্বীয় মুবারক হাত বুলিয়ে দিলে স্তন দুধে ভরে গেলো। তিনি-ﷺ-দুধ দোহন ক'রে একটি বড় পাত্র ভরে নিলেন। উম্মে মা'বাদ এ অলৌকিক ঘটনা দেখে বিস্মিত ও বিহবল হয়ে গেল। সবাই পেটপুরে পান করলেন। অতঃপর আর এক পাত্র ভরে উম্মে মা'বাদকে দিয়ে তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন।

এদিকে মদীনাবাসী তাঁর শুভাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। প্রতিদিন তাঁরা মদীনার বাইরে প্রতীক্ষায় থাকতেন। যেদিন তাঁর আগমন হয়, সেদিন সবাই পুলকিত হৃদয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তিনি মদীনার নিকটে কুবা নগরীতে যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে চার দিন অবস্থান করেন। তিনি এ সময়ে কুবা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এটাই ইসলামের প্রথম মসজিদ। ৫ম দিনে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। অনেক আনসারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে অতিথি হিসাবে বরণ ক'রে ধন্য হওয়ার চেষ্টা করেন

এবং তার উঁটের লাগাম ধরেন। তিনি তাঁদের শুকরিয়া আদায় করে বলেন, "উট ছেড়ে দাও, সে নির্দেশ প্রাপ্ত"। আল্লাহর নির্দেশ যেখানে হলো সেখানে গিয়ে উট বসে গেলো। তিনি অবতরণ না করতেই উঠে সে অগ্রভাগে কিছু পথ চলে আবার পিছনে এসে প্রথম স্থানে বসে গেলো। সেটাই ছিলো মসজিদে নববীর স্থান। তিনি আবূ আইয়ূব আনসারীর অতিথি হোন। আলী ইবনে আবূ ত্বালিব নবীর-ﷺ-হিজরতের পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট রক্ষিত মানুষের আমানত তাদের প্রাপকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। অতঃপর কুবায় নাবী কারীম-ﷺ-এর সাথে মিলিত হোন।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মদীনায়

উট যেখানে বসে গিয়েছিল, সে জায়গাটি প্রকৃত মালিক থেকে কিনে নেওয়ার পর সেখানে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর মসজিদ নির্মাণ করেন। মক্কা থেকে আগত মুহাজির সাহাবীগণ এবং মদীনার আনসার সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। প্রত্যেক আনসারীর জন্য একজন মুহাজির ভাই দেয়া হয়। যে তাঁর ধন-সম্পদের অংশী- দার হয়েছিল। মুহাজির ও আনসারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় হয়।

মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে কুরাইশদের সম্পর্ক ছিলো। ফলে তারা তাদের দ্বারা মুসলিদের মাঝে বিশৃংখলা, নৈরাজ্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাতো। কুরাইশরা মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকিও

প্রদর্শন করতো। এ ভাবে বিপদ ও আশঙ্কা মুসলিমদেরকে ভিতর ও বাহির থেকে ঘিরে ছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে ছিলো যে, সাহাবাগণ রাতে ঘুমাবার সময় অস্ত্র রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমন বিপজ্জনক ও বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেন। তাই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-শত্রুদের তৎপরতা জানার লক্ষ্যে সামরিক মিশন চালানো আরম্ভ করেন। অনুরূপ শত্রুদের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু নিতে ও তাতে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে লাগলেন, যাতে তারা মুসলিমদের শক্তির কথা উপলব্ধি করে শান্তি ও সন্ধি প্রক্রিয়ায় এসে ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতায় ও তা বাস্তবায়নে কোন ধরণের বিঘ্ন না ঘটায়। এমন কি কতিপয় গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

বদরের যুদ্ধ

একবার রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কুরাইশদের এক বাণিজ্যিক কাফেলার পথ রোধ করার পরিকল্পনা নিয়ে তিনশত তেরজন সাথীসহ বের হোন। তাঁদের সাথে ২টি ঘোড়া ৭০টি উট ছাড়া কিছুই ছিল না। এ দিকে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলায় উট ছিল এক হাজার এবং লোক ছিলো ৪০জন। আবূ সুফিয়ান এ কাফেলার নেতৃত্বে দিচ্ছিল। আবূ সুফিয়ান মুসলিমদের বের হওয়ার ব্যাপারটা জেনে যায়। তাই জরুরী ভিত্তিতে এক লোক পাঠিয়ে মক্কায় খবর দেয় এবং সাহায্যের আবেদন জানিয়ে রাস্তা পরিবর্তন ক'রে অন্য পথ ধরে। ফলে মুসলিমরা তাদেরকে ধরার সফলতা থেকে বঞ্চিত হোন। অন্য দিকে কুরাইশরা এ খবর পেয়ে ১০০০ যোদ্ধা নিয়ে বের হয়ে পড়ে। পরে আবূ সুফিয়ানের দূত এসে

কাফেলার নিরাপদে ফিরে আসার খবর জানিয়ে তাদেকে মক্কায় ফিরে যাবার অনুরোধ জানায়। কিন্তু আবূ জেহেল ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং যোদ্ধারা বদর নামক স্থান পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখে।

কুরাইশদের বের হবার কথা জেনে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সাহাবা-ﷺ-দের সাথে পরামর্শ করলে সবাই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত প্রকাশ করেন। হিজরী ২য় সনে রমযান মাসের ১৭ তারীখের প্রভাতে উভয়দল মুখোমুখি হয় এবং তুমুল যুদ্ধ চলে। মুসলিমদের জয়ের মাধ্যমে যুদ্ধ সমাপ্তি হয়। তাদের মধ্যে ১৪জন শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। ৭০জন কাফের নিহত এবং ৭০জন বন্দী হয়। যুদ্ধকালীন নবীর কন্যা ও উসামান ইবনে আফফান-ﷺ-র স্ত্রী রুকাইয়া মৃত্যু বরণ করেন। উসমান-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নির্দেশে তাঁর রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পরিচর্যা ও দেখা-শুনার জন্য মদীনায় থেকে যাওয়ার ফলে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর আর এক মেয়ে উম্মে কুলসুমের সাথে উসমান-ﷺ-র বিয়ে দেন। তাই তাঁর উপাধি ছিলো "যুননূরাইন"। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর দু'টি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।

যুদ্ধ শেষে মুসলিমরা আল্লার সাহায্যে উল্লসিত ও আনন্দিত হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁদের সাথে ছিল যুদ্ধ বন্দী ও গনিমতের মাল। যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে কিছু লোককে মুক্তিপণের বিনিময়ে, আবার অনেককে এমনিতে মুক্তি দেয়া হয়। তাদের মধ্যে কিছু লোকের মুক্তি

পণ ছিলো, মুসলিমদের ১০জন ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়ে দেয়া।

ওহুদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের এক বছর পর মুসলিম ও মক্কার কাফেদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুশরিকরা বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে তিন হাজার (৩০০০) যোদ্ধা নিয়ে বের হয়। মুসলিমদের প্রায় সাতশ' (৭০০) মুজাহিদ তাদের মুখোমুখি হোন। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমরা বিজয়ী হোন এবং তাদের উপর জয়লাভ করেন। মুশরিকরা মক্কার দিকে পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু পরে পাহাড়ের দিক দিয়ে এসে মুসলিমদের ধ্বংস সাধন করতে আরম্ভ করে। যখন তীরন্দাজরা পাহাড়ের সেই ঘাঁটি খালি ছেড়ে গনী-মতের মাল জমা করার জন্য নীচে অবতরণ করেন, যেখানে তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সুপরিকল্পিতভাবে নিযুক্ত করে ছিলেন। ফলে এ যুদ্ধে মুশরিকদের পাল্লা ভারী হয়ে যায়।

খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ

ওহুদ যুদ্ধের পর মদীনার কিছু ইয়াহুদী মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানি দেয়, তাদেরকে সমর্থন এবং সাহায্য-সহযোগিতা করার অঙ্গীকারও করে। ফলে কাফেররা ইতিবাচক সাড়া দেয়। অতঃপর তারা (ইয়াহুদীরা) অন্যান্য গোত্রকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানি দিলে তারাও ইতিবাচক সাড়া দেয়। প্রত্যেক

এলাকা থেকে তারা মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দেয়। প্রায় দশ হাজার (১০,০০০) যোদ্ধা সমবেত হয়।

নবী-ﷺ-শত্রুপক্ষের তৎপরতার কথা জেনে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সালমান ফারসী-ﷺ-মদীনার যে দিকে পাহাড় নেই, সেদিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। সব মুসলিম উদ্যম ও প্রেরণা সহকারে পরিখা খননে অংশ গ্রহণ করেন এবং অতি সত্বর এ কাজ সমাপ্ত হয়। মুশরিকরা এক মাস পর্যন্ত অবস্থান করেও পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লা প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ ক'রে কাফেরদের তাঁবুসমূহ উপড়ে ফেলেন। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শীঘ্রই নিজ নিজ শহরে ফিরে যায়। মুশরিক দলকে আল্লাহই পরাজিত করেন এবং তিনিই মুসলিমদের সাহায্য করেন।

মক্কা বিজয়

হিজরি ৮ম সনে নবী রনীম-ﷺ-মক্কা বিজয় অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই ১০ই রমযান দশ হাজার সদস্যের বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন। মক্কায় উল্লেখ যোগ্য কোন যুদ্ধ ছাড়াই প্রবেশ করেন। (কোন যুদ্ধ ছাড়াই) কুরাইশরা আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তাআ'লা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। নবী করীম-ﷺ-মসজিদে হারাম অভিমুখে রওনা করেন। এবং কা'বা তাওয়াফ ক'রে কা'বার অভ্যন্তরে দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। অতঃপর কা'বার ভিতরে ও উপরে রাখা সব মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। তারপর

কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে মসজিদে হারামে কাতার বদ্ধভাবে অপেক্ষারত সমবেত কুরাইশদেরকে বলেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের সাথে কি আচরণ করব বলে মনে করো?" তারা বলে, ভাল আচরণ, সম্ভ্রান্ত ভাই, সম্ভ্রান্ত ভাইয়ের পুত্র। তিনি বলেন, "যাও তোমরা সবাই মুক্ত।" রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ক্ষমার উজ্জ্বল ও বৃহত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেন। তারাই সেই লোক, যারা তাঁর সাহাবাদের উপর চালিয়ে ছিলো অত্যাচরের স্টীম রোলার, তাঁদের কষ্ট দিয়েছে এবং তাঁকে নিজের মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে।

মক্কা বিজয়ের পর লোক জন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের ছায়া- তলে সমবেত হয়। হিজরি ১০ম সনে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-হজ্জ করেন। এটাই ছিল তাঁর এক মাত্র হজ্জ। তাঁর সাথে এক লাখের অধিক লোক হজ্জ করেন। হজ্জ পালন শেষে নবী করীম-ﷺ-মদীনায় প্রত্যাগমন করেন।

প্রতিনিধি দলের আগন এবং বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণ

নবী-ﷺ-করীম-এর আনীত বিষয়ের বিকাশ ঘটলে এবং তাঁর দাওয়াত বিস্তার লাভ করলে প্রত্যেক স্থান থেকে দলে দলে মানুষ মদীনা অভিমুখে আসতে শুরু করল এবং ইসলামে প্রবেশের ঘোষণা দিতে লাগলো।

অনুরূপ নবী করীম-ﷺ-ও বিভিন্ন রাজা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিতট পত্র প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে লাগলেন। কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিলো। কেউ সুন্দরভাবে পত্রের উত্তর দিয়েছিলে এবং (নবী করীম-ﷺ-এর) জন্য

উপঢৌকনও পাঠিয়েছিলে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি। আবার কেউ তাঁর পত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো। যেমন পারস্যের বাদশাহ খুসরু নবী করীম-ﷺ-এর পত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো। ফলে তিনি তার উপর বদ্দুআ ক'রে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! তার রাজ্যকেও টুকরো টুকরো করে দাও।" তাই কিছু দিনের মধ্যেই তার পুত্র তার উপর আক্রমণ ক'রে তাকে হত্যা ক'রে তার কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়ে ছিলো।

মিসরের বাদশাহ মুক্বাউক্বেস ইসলাম গ্রহণ করেনি, তবে সে নবী করীম-ﷺ-এর বড়ই সম্মান করেছিল এবং দূত মারফত নবীর জন্য উপঢৌকন পাঠিয়ে ছিলো। রোম সম্রাট কেসরাও অনুরূপ আচরণ করেছিলো। সেও বড় উত্তমভাবে (পত্রের) উত্তর দিয়ে ছিলো এবং নবী করীম-ﷺ-এর দূতের বড়ই শ্রদ্ধা করেছিলো। আর বাহরাইনের বাদশাহ মুনযির ইবনে সাওয়ার কাছে যখন নবী করীম-ﷺ-এর পত্র পৌঁছে, সে তা পাঠ ক'রে বাহরাইনবাসীদেরকে শুনায়। ফলে তাদের মধ্যে অনেকে ঈমান আনে এবং অনেকে অস্বীকার করে।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মৃত্যু

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রায় আড়াই মাস পর তিনি-ﷺ-রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আর রোগ দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। (রোগের কারণে) ইমামতি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে আবূ বাকার-رضي الله عنه-কে ইমামতি করতে বলেন। হিজরি ১১সনে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার রাসূলুল্লাহ-

ﷺ-মৃত্যু বরণ ক'রে তাঁর মহান সাথীর কাছে যাত্রা করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। এ খবর শুনে সাহাবাগণ প্রায় জ্ঞান ও স্বস্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁরা এ খবর বিশ্বাস করতে পার ছিলেন না। এহেন সময় আবূ বাকার সিদ্দীক-ﷺ-এক ভাষণে লোক-জনকে শান্ত করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-একজন মানুষ ছিলেন বিধায় তিনিও মৃত্যু বরণ করেছেন, যেমন অন্যান্য মানুষ মৃত্যু বরণ করে। মানুষ শান্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো হয় এবং তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র হুজরাতে তাঁকে দাফন করা হয়। রাসূলু- ল্লাহ-ﷺ-নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর ও পরে তের বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় জীবনযাপন করেন।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মৃত্যুর পর মুসলিমরা ঐক্যমতে আবূ বাকার-ﷺ-কে নিজেদের খলিফা নির্বাচন করেন। তাই তিনি ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে প্রথম খলীফা ছিলেন।

নবী করীম-ﷺ-এর সৃষ্টিগত গুণ

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মাঝারি গোছের মানুষ ছিলেন। খুব লম্বাও না, অতি খাটোও না। উভয় কাঁধের প্রশস্ততার, সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক গঠনের এবং উন্মুক্ত বক্ষের অধিকারী ছিলেন। মানুষের মধ্যে সব চেয়ে সুদর্শন ছিলেন। তাঁর লাল-সাদা মিশ্রিত গোলাকার মুখমন্ডল ছিল। সুরমা বরণ চোখ, পাতলা নাক, সুন্দর মুখাকৃতি এবং ঘন দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি অতি সুন্দর সৌরভ এবং নরম ও নাজুক ছিলেন। আনাস ইবনে মালিক-

বলেন, 'আমি মেশক আম্বর (কস্তুরী) ও এমন কোন সুগন্ধি শোঁখিনি, যা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর চেয়ে অধিক সুগন্ধময় এবং আমার হাত এমন কোনো জিনিস স্পর্শ করেনি, যা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর হাতের চেয়েও অধিক কোমল।' তিনি ছিলেন হাসিমুখো। স্নিগ্ধ হাসির, সুন্দর স্বরের এবং মিতভাষিতার অধিকারী ছিলেন। আনাস ইবনে মালিক-رضي الله عنه-তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি মানুষের মধ্যে সব থেকে সুন্দর, সব চেয়ে দান-শীল এবং সর্বাপেক্ষা নির্ভীক বীর ও সাহসী ছিলেন।'

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর চরিত্র

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সর্বাপেক্ষা নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। আলী ইবনে আবূ ত্বালিব-رضي الله عنه-বলেন, যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হত, এক দল অন্য দলের মুখোমুখি যুদ্ধ করত, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে আড়াল হিসাবে রাখতাম-ﷺ-তিনি সর্বাপেক্ষা দানবীর ছিলেন। কখনো কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি না করেননি। তিনি সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল ছিলেন। নিজের জন্য কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি এবং নিজের স্বার্থের জন্য কখনো রাগান্বিত হোননি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আল্লাহর নিমিত্তেই প্রতিশোধ নিয়েছেন। অধিকারের ব্যাপারে তাঁর নিকটে আত্মীয় অনাত্মীয়, দুর্বল, সবল সবাই সমান ছিলো। তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, তাকওয়া ছাড়া আল্লাহর কাছে কেউ কারো চাইতে শ্রেয় নয়। সবাই মানুষ সমান। পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তারা তাকে

ছেড়ে দিতো, আর কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে শাস্তি দিতো, তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ চুরি করে, তবে আমি তাঁরও হাত কর্তন করব।"

তিনি কখনো কোনো খাবারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেননি। রুচি সম্মত হলে আহার করতেন। অন্যথায় বর্জন করতেন। কখনো মুহাম্মাদের পরিবারের উপর এমনও সময় আসত যে, এক মাস দু'মাস পর্যন্ত তাঁর বাড়ীতে আগুন জ্বলত না। তিনি ও তাঁর পরিবার শুধু খেজুর ও পানি আহার করেছেন। ক্ষুধার তীব্র জ্বালা প্রশমিত করার জন্য মাঝে মাঝে উদর মুবারকে প্রস্তর বেঁধে রাখতেন। তিনি জুতা সিলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন। গৃহ কর্মে তাঁর পরিবারবর্গের সহযোগিতা করতেন। অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন। তিনি অতি নম্র ছিলেন। ধনী-গরীব, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত সবার দাওয়াত গ্রহণ করতেন। গরীবদের ভালোবাসতেন। তাদের জানাযায় হাজির হতেন। পিড়ীত লোকদের দেখতে যেতেন। কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দারিদ্র্যের জন্য ঘৃণা করতেন না। কোনো রাজা বা শাসককে তার রাজত্ব ও যশ-ঐশ্বর্যের কারণে ভয় করতেন না। তিনি ঘোড়া, উট, গাধা ও খচ্চরের উপর আরোহণ করতেন।

তিনি সব চাইতে বেশী স্নিগ্ধ হাসতেন। সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ছিলেন। অথচ দুঃখ বিপদ অনবরত তাঁর উপর আসতে থাকত। সুগন্ধ ভাল বাসতেন। দুর্গন্ধ ঘৃণা করতেন। আল্লাহ পাক চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সুন্দর

কর্মের অনুপম সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে। মহান আল্লাহ তাঁকে এমন জ্ঞান দান করেছিলেন, যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্য কাউকে দান করা হয়নি। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। জানতেন না লেখা-পড়া। মানুষের মধ্যে কেউ তাঁর শিক্ষক ছিলো না। আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে আসেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন, যার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন,

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الاسراء :٨٨]

"বলুন, যদি মানুষ ও জ্বীন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না।" (সূরা ইসরাঃ ৮৮) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিরক্ষর হওয়াটাই হল মিথ্যা অপবাদকারীদের সব অহেতুক প্রলাপের অকাট্য, অপ্র তিরোধ্য ও অখন্ডনীয় উত্তর। যাতে এ কথা বলতে না পারে যে, তিনি স্বহস্তে লিখেছেন অথবা অন্যের কাছে শিখেছেন বা পূর্বের কোন সূত্র থেকে পাঠ করে সংগ্রহ করেছেন।

তাঁর কতিপয় মু'জেযা

তাঁর সব চাইতে বড় মু'জেজা হল ক্বুরআনুল কারীম। এ মু'জেজা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ মু'জেজা আরবি সাহিত্যের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের অপারগ করে দিয়েছে। আল্লাহ সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে, ক্বুরআনের অনুরূপ দশটি সূরা অথবা একটি

সূরা বা অন্ততঃপক্ষে একটি আয়াত রচনা আনয়ন করো। মুশরিকরা কুরআনের মু'জেযার সাক্ষ্য দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মু'জেযার মধ্যে হল, মুশরিকরা একবার তাঁকে একটি নিদর্শন দেখানোর কথা বললে তিনি চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়াকে দেখালেন। চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অনেক বার তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উৎসারিত হয়েছে। তাঁর হাতে পাথর তাসবীহ পাঠ করেছে। অতঃপর আবূ বাকার, উমার ও উসমানের হাতে সে পাথর তিনি রেখে দিলে তাঁদের হাতেও তাসবীহ পাঠ করেছে।

তিনি যখন আহার করতেন, তখন খাদ্যের তাসবীহ পাঠ করার ধ্বনি সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পেতেন। পাথর ও গাছ-পালা তাঁকে সালাম করতো। এক ইয়াহুদী নারী রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বিষপানে হত্যা করার জন্য ছাগলের এক বিষ মাখা রানের গোশত খেতে দিলে সে রান রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে কথা বলেছে। একবার এক বেদুঈন তাঁকে একটি নিদর্শন দেখাতে বললে তিনি একটি গাছকে নির্দেশ দিলে গাছটি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে আসে। আবার নির্দেশ দিলে যথাস্থানে চলে ফিরে যায়। এক দুগ্ধবিহীন ছাগলের স্তনে হাত মুবারাক স্পর্শ করলে তাতে দুধ ভরে আসে। তিনি তা দোহন করে নিজেও পান করেন এবং আবূ বাকারকেও পান করতে দেন। আলী ইবনে আবূ ত্বালিবের ব্যথিত চোখে তিনি থুথু লাগায়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা ভাল হয়ে যায়। এক সাহাবীর পা আহত হওয়ার পর তিনি-ﷺ-হাত বুলিয়ে

দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যায়। আনাস ইবনে মালিকের জন্য সুদীর্ঘায়ু, স্বচ্ছলতা এবং সন্তান-সন্ততি বেশী হওয়ার জন্য দুআ করলে আল্লাহ তাঁর এসব জিনিসে এত বরকত দান করেন যে, তাঁর ১২০জন সন্তান জন্ম নেয়, তাঁর খেজুর গাছ বছরে দু'বার ফল দিতে লাগে, অথচ এ কথা সুবিদিত যে খেজুর গাছে বছরে এক বারই ফল আসে। আর তিনি ১২০ বছর বয়স পান। সাহাবায়ে কেরামদের একজন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে অনাবৃষ্টি ও খরার অভিযোগ করলে তিনি মিম্বার থেকেই হাত তুলে দুআ' করেন। আকাশে কোনো মেঘ ছিলো না, হঠাৎ পর্বত সম মেঘ ছেয়ে যায় এবং পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত মুষল ধারায় বৃষ্টি হয়। ফলে আবার অতিবৃষ্টির অভিযোগ করা হয়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-দুআ' করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ বেরিয়ে রৌদ্রের তাপে (বাড়ির দিকে) যাত্রা করে।

একটি ছাগল ও এক 'সাআ' (আড়াই কিলো গ্রাম) যব দিয়ে এক হাজার পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে খাওয়ান। সকলে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে যান, কিন্তু খাবার সামান্যও কম কমেনি ছিল। অনুরূপভাবে অল্প খেজুর দিয়ে পরিখা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ান। এ খেজুর বাশির ইবনে সা'দের মেয়ে তার পিতা ও মামার জন্য নিয়ে এসেছিল। আবূ হুরাইরা-ﷺ-র স্বল্প খাদ্য দ্বারা পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে পেটভরে আহার করিয়ে ছিরেন। তাঁকে (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে) হত্যা করার জন্য অপেক্ষারত একশ'জন কুরাইশী ব্যক্তির মুখের উপর মাটি ছিটিয়ে দিলে কেউ তাঁকে দেখতে সক্ষম হয়নিছিল। তিনি তাদের নাকের ডগাদিয়ে

চলে গেলেন। সুরাক্বা ইবনে মালেক তাঁকে হত্যা করার জন্যে পিছু নিয়েছিল। যখন সে তাঁর নিকটবর্তী হয়, তিনি তখন তার জন্য বদ্দুআ' করলে তার ঘোড়ার পা মাটিতে ঢুকে যায়।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর জীবনী থেকে সংগৃহীত উপদেশাবলী

তাঁর রসিকতাঃ নবী করীম-ﷺ-তাঁর সাহাবীদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন। তবে তিনি সত্যই বলতেন। তাঁর পরিবারের সাথেও রসিতাকতা করতেন। ছোটদের গুরুত্ব দিয়ে তাঁর সময়ের কিছু সময় তাদের জন্যও নির্দিষ্ট করতেন। তাদের সাথে তাদের বোধ ও সামর্থ্য অনুযায়ী আচরণ করতেন। কখনো তিনি তাঁর খাদেম আনাস ইবনে মালিক-ﷺ-র সাথে রহস্য ক'রে বলতেন, 'ইয়া যাল উযুনায়ইন' "হে দু'টি কর্ণধারী" এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ! আমাকে একটি সওয়ারী দিন। তিনি তাকে ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, "আমরা তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাছুর দিবো। সে বললো, উষ্ট্রীর বাছুর দিয়ে আমি কি করবো? তখন নবী করীম-ﷺ-বললেন, "উটকে উষ্ট্রী ছাড়া আবার কে প্রসব করে? স্বীয় সাথীদের সাথে সব সময় মুচকি হাসি ও প্রফুল্লতা প্রদর্শন করতেন। তাঁর নিকট থেকে তাঁরা উত্তম বাক্য ব্যতীত কিছুই শুনতেন না। জারির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখন থেকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাকে বাধা দান করেননি (অর্থাৎ, যে কোন সময় তাঁর কাছে প্রবেশ করতে বাধা দান করেননি) এবং আমাকে দেখলেই মুচকি হাসি দিয়েছেন। (একদা)

আমি তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির বসে থাকতে পারি না, তখন তিনি আমার বুকে চাপড় দিয়ে দুআ' করলেন,

((اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا))

"হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখো এবং সৎপথ প্রদর্শনকারী ও সৎপথ প্রাপ্ত করে দাও।" (বুখারী-মুসলিম) তিনি তাঁর আত্মীয়দের সাথেও রসিকতা করতেন। একদা তিনি তাঁর মেয়ে ফাতিমার বাড়িতে এলেন, কিন্তু বাড়িতে তাঁর স্বামী আলীকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কোথায়?" ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তাঁর ও আমার মধ্যে (সামান্য) মনোমালিন্য হলে তিনি আমার উপর রাগ ক'রে বের হয়ে গেছেন। তিন-ﷺ-তাঁর কাছে এলেন। তিনি মসজিদে শুয়ে ছিলেন। তাঁর চাদরটা (গা) থেকে পড়ে গেছিল, তাই গায়ে ধুলা লেগেছিলো। তিনি-ﷺ-তাঁর শরীর থেকে ধুলা মুছতে মুছতে বললেন,

((قُمْ يَا أَبَا التُّرَاب، قُمْ يَا أَبَا التُّرَاب))

"হে মাটির বাপ উঠো! হে মাটির বাপ উঠো!"

ছোটদের সাথে তাঁর আচরণ

তাঁর মহান চরিত্রের একটি বিরাট অংশ ছোটরাও পেয়েছে। তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁকে তাঁর বান্ধবীদের সাথে খেলতে দিতেন। আয়েশা (রাযী আল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি নবী করীম-ﷺ-এর নিকটেই পুতুল নিয়ে খেলা

করতাম। আমার অনেক বান্ধবী ছিল, তারা আমার সাথে খেলা করত। নবী করীম-ﷺ-বাড়িতে প্রবেশ করলে তারা লুকিয়ে যেতো। তিনি তাদেরকে আবার আমার সাথে খেলতে পাঠাতেন।' (বুখারী ৬১৩০) অনুরূপ তিনি ছোটদের গুরুত্ব দিতেন। তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন। যমেন, আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'বিকালের কোন এক নামাযে (যোহর অথবা আসরে) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি হাসান অথবা হুসায়েনকে কোলে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে নামিয়ে দিলেন। অতঃপর তকবীর দিয়ে নামায আরম্ভ করলেন। সাজদা করলে তা সুদীর্ঘ করলেন। আমার পিতা বলেন, আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাজদারত অবস্থায় শিশুটি তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসেছে। আমি পুনরায় সাজদায় ফিরে গেলাম। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-নামায শেষ করলে, লোকে বললে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত সুদীর্ঘ সাজদা করেছেন যে, আমরা মনে করেছিলাম, কোনো কিছু ঘটেছে অথবা আপনার প্রতি অহী অবতীর্ণ হচ্ছে, তিনি-ﷺ-বললেন,

((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ))

"এ সবের কোনো কিছুই ঘটেনি, তবে আমার এই ছেলেটা আমার উপরে চড়ে বসেছিল তাই তাকে ত্বরান্বিত করতে ভাল মনে করলাম না, যাতে সে তার সাধ-ইচ্ছা পূরণ করে নেয়।" আনাস ইবনে মালিক-

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী করীম-ﷺ-মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি আমার এক ছোট ভাইকে (রসিকতা ক'রে) বলতেন, "ইয়া আবা উমায়ের মা-ফা'আলান্নু-গায়ের?" (হে উমায়েরের বাপ! তোমার নুগায়েরের খবর কি?) 'নুগায়ের' ছোট সেই পাখীটা, যাকে নিয়ে ছেলেটি খেলা করত (পাখিটি মারা গেলে তিনি তাকে এ কথা বলেছিলেন)। এর মধ্যে রয়েছে, ছেলেটির প্রতি সান্ত্বনা দেওয়ার সুর।

স্বীয় পরিবারবর্গের সাথে তাঁর আচরণ

স্বীয় পরিবারবর্গের সাথে নবী করীম-ﷺ-এর আচরণের ব্যাপারেও দেখা যায়, যে চারিত্রিক সকল উৎকর্ষ তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি সর্বাধিক নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি সব সময় তাঁর পরিবারের প্রয়োজনাদির খেয়াল রাখতেন। মহিলাদেরকে মানুষ, জননী, স্ত্রী এবং কন্যা ও জীবন সঙ্গিনী হিসেবে গণ্য ক'রে তাদের মর্যাদা দান করতেন। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, মানুষের মধ্যে আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী কে? তিনি বললেন "তোমার মা। তারপর তোমার মা। তারপর তোমার মা। তারপর তোমার বাপ।" তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের কোনো একজনকে পেলো, কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না, ফলে মারা গিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করল, তাকে আল্লাহ (তাঁর রহমত থেকে আরো) দূর করুন!" তিনি স্বীয় স্ত্রীর পান করা পাত্র নিয়ে নিজের মুখ

সেখানেই লাগিয়ে পান করতেন, যেখানে তাঁর স্ত্রী মুখ লাগিয়ে পান করেছিলেন। আর তিনি-ﷺ-বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সেই সব চেয়ে উত্তম, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য উত্তম।"

তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য

তাঁর দয়ার বর্ণনা হলো এই যে, তিনি বলেছেন,

((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

"দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি দয়াবান আল্লাহ দয়া করবেন। তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" আমাদের মহান নবী এই মহান চরিত্রের বহু অংশের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্রিক এই উৎকর্ষ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে সবার সাথে, তাতে ছোট হোক অথবা বড়, আত্মীয় হোক, কিংবা অনাত্মীয়। আর এটাও তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের একটা দিক যে, তিনি শিশুর কান্নার শব্দ শুনে নামাযকে লম্বা না করে হাল্কা করতেন। যেমন, আবূ ক্বাতাদা-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ))

"আমি নামাযে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা করি তা লম্বা করার, কিন্তু শিশুর কান্নার শব্দ শুনে আমি আমার নামাযকে সংক্ষিপ্ত করি, কারণ আমি শিশুর মাকে

কষ্ট দিতে চাইনা।" উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া এবং তাদের আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ হওয়ার ব্যাপারে তিনি এতই আগ্রহী ছিলেন যে, এক ইয়াহুদী বালক-সে নবী করীম-ﷺ-খেদমত করতো-অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখার জন্য এসে তার মাথার কাছে বসে তাকে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ করো।" ছেলেটি তার মাথার কাছে দন্ডায়মান স্বীয় পিতার দিকে তাকালে তার পিতা তাকে বললো, আবূল ক্বাসিম-এর আনুগত্য করো।" ফলে ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর একটু পরেই সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এই বলতে বলতে তার কাছ থেকে বের হয়ে গেলেন, "সেই আল্লাহরই প্রশংসা যিনি একে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।"

তাঁর সহিষ্ণুতা

তাঁর সহিষ্ণুতা সম্পর্কে বলতে গেলে এটাই বলা যায় যে, তাঁর সম্পূর্ণ জীবনটাই সহিষ্ণুতা-ধৈর্যশীলতা, এবং জিহাদ ও শ্রম-সাধনায় পরিপূর্ণ। যেদিন প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়, সেদিন থেকে নিয়ে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে সহিষ্ণুতা অবলম্বন ক'রে বিরতিহীন আমল জারী রেখেছিলেন। যেদিন তিনি নবীরূপে নির্বাচিত হোন, প্রথম যেদিন ফেরেশতার সাথে কাঁর সাক্ষাৎ হয়, যেদিন খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে ওরাক্বা ইবনে নাওফালের কাছে নিয়ে যান, ওরাক্বা ইবনে নাওফাল তাঁকে যখন বললেন, আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করবে,

তিনি-ﷺ-তখন ওরাক্বা ইবনে নাওফালকে জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দিবে?" অরক্বা বললেন, হ্যাঁ, কারণ, যা নিয়ে তুমি এসেছ, তদ্রূপ কোন কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে, সেই দিন থেকে তিনি নিশ্চিতভাবে অবগত ছিলেন যে, এই পথে তাঁকে কোনো কোনো জিনিসের সম্মুখীন হতে হবে। ফলে তিনি শুরু থেকেই কষ্ট, কাঠিন্য এবং প্রতারণা ও শত্রুতা সহ্য করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিলেন।

অনুরূপ তাঁর ধৈর্যের বাস্তব চিত্র তখনও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল, যখন তিনি মক্কায় তাঁর প্রতিপালকের পায়গাম পৌঁছাতে গিয়ে স্বীয় জাতি, পরিবারবর্গ এবং নিজের বংশের লোকদের নিকট থেকে দৈহিক পীড়া প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমন, বুখারী শরীফে বর্ণিত যে, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনে আ'সকে অতীব কঠিন সে আচরণটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যা মুশরিকরা নবী করীম-ﷺ-এর সাথে করেছিল। তিনি বললেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কা'বার পাশে নামায পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় উক্ববা ইবনে আবূ মুয়ীত্ব তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে নিজের চাদর তাঁর গলায় জড়িয়ে খুব জোরে টান দেয়। তখন আবূ বাকার-ﷺ-তার (উক্ববার) কাঁধ দু'টি ধরে তাকে নবী করীম-ﷺ-থেকে ঠেলে সরিয়ে দেন এবং বললেন, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ?'

একদা তিনি-ﷺ-কা'বার নিকট নামায পড়ছিলেন। আর আবূ জেহেল ও তার কয়েকজন সঙ্গী সেখানে বসেছিল। এমন সময় তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে উমুক গোত্রের উঁটের বাচ্চাদানি এনে মুহাম্মাদ যখন সাজদায় যাবে তখন তার পিঠের উপর রেখে দিতে পানবে? অতঃপর তাদের মধ্যেকার সর্বাধিক হত-ভাগ্য ব্যক্তিটি উঠে গিয়ে তা এনে অপেক্ষায় রইলো। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন সাজদায় গেলেন, তখন সেই পাষন্ডটি সেটি তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে পিঠের উপর রেখে দিল। তারপর তারা হাসাহাসি করতে করতে একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়তে লাগল। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সাজদায় ছিলেন, তিনি মাথা তুলতে পারছিলেন না। এমন সময় তাঁর মেয়ে ফাতিমা এসে তা তাঁর পিঠ থেকে এই কষ্টদায়ক বস্তুটি সরিয়ে দিলেন।

এর থেকেও কঠিন ছিল তাঁর মানসিক কষ্ট, যা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার, তাঁকে তিনি জ্যোতিষী, কবি, পাগল এবং যাদুকর বলার কারণে। অনুরূপ তাদের এ কথা বলার কারণে যে, তিনি যেসব নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন, তা সবই হল, পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী। এরই পর্যায়ভুক্ত হল আবূ জেহেলের বিদ্রূপমূলক এই উক্তি, 'হে আল্লাহ! যদি এই (মুহাম্মাদ) তোমার পক্ষ থেকে সত্যবাদী হয়, তাহলে আমাদের উপরে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপরে কঠিন আযাব নাযিল কর। তাঁর চাচা আবূ লাহাব তো সব সময়

তাঁর পিছনে লেগে থাকত যখন তিনি লোকদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাদের সমাবেশে এবং বাজারে যেতেন। সে (আবূ লাহাব) তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করত এবং লোকদের নিষেধ করত তাঁর সত্যায়ন করতে। এদিকে তার স্ত্রী উম্মে জামীল কাঁটা বিশিষ্ট ডাল কেটে এনে তাঁর পথে ফেলে রাখতো।

আর তখন নির্যাতন-নিপীড়ন সীমা অতিক্রম করে যায়, যখন তাঁকে তাঁর সাথীদের সহ তিন বছর পর্যন্ত আবূ ত্বালিবের উপত্যাকায় অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। এমন কি ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি করার জন্য গাছের পাতা খেতে বাধ্য হয়। তাঁর দুঃখ-কষ্ট তখন আরো বৃদ্ধি পায়, যখন তিনি তাঁর চাচাকে হারান। যিনি তাঁর সংরক্ষণ করতেন এবং তাঁর হয়ে খণ্ডণ করতেন। অতঃপর হঠাৎ করে তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) মারা যান। যিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন ও তাঁর সাহায্য করতেন। পরিশেষে তাঁকে হত্যা করার কয়েকবার প্রচেষ্টা চালানোর পর তিনি তাঁর মাতৃভূমি থেকে তিনি হিজরত করে চলে যান। মদীনায় ধৈর্য ও ত্যাগের নতুন জীবন শুরু হয়। সে জীবন ছিল শুধু কষ্ট ও পরিশ্রমের, ক্ষুধা ও অভাবের এবং ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে রাখার জীবন, তিনি-ﷺ-বলেন,

((لَقَدْ أُخِفْتُ فِي الله وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي الله وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ))

“আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের কাজে আমাকে যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে করা হয়নি। আমাকে যেভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে দেওয়া হয়নি। ত্রিশ দিন ও রাত আমার উপর এমনও অতিবাহি হয়ে গেছে যে, আমার ও বিলালের কাছে কোনো প্রাণীর খাবার মত কিছুই ছিল না। কেবল সেই স্বল্প পরিমাণটুকু ছাড়া, যা বিলাল তাঁর বগলের তলে লুকিয়ে এনেছিল।”

তাঁর সম্ভ্রমে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। মুনাফেক্ব ও মূর্খ বেদুঈন লোকদের পক্ষ থেকেও তাঁকে কষ্ট পেতে হয়েছিল। বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-(যুদ্ধলব্ধ মাল) বন্টন করলেন। আনসারদের হতে একজন বললো, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা নেই। ইবনে মাসউদﷺ-বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকটে এসে এ কথার খবর দিলাম। (শুনে) তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তিনি বলেন,

((رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ))

“আল্লাহ মুসার প্রতি রহম করুন! তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন।”

তাঁর ধৈর্য ধরার মুহূর্তগুলোর মধ্যে হলো, সেই দিনগুলো, যেদিনে তাঁর ছেলে-মেয়েরা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সন্তান ছিলো সাতজন। একের পর এক তাঁরা সবাই মারা যান। ফাতিমা ব্যতীত তাঁদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। তবুও তিনি না দমে গেছিলেন, আন না

ভেঙ্গে পড়েছিলেন, বরং ধৈর্যের উন্নত নিদর্শন পেশ করেছিলেন। এমন কি যেদিন তাঁর ছেলে ইব্রাহীমের মৃত্যুর হয়, সেদিন তিনি বলেছিলেন,

((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ))

"চক্ষু অশ্রু ঝরাবে, অন্তর ব্যথিত হবে এবং আমরা তা-ই বলব, যা বললে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হোন। আর হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে মর্মাহত। আর নবী করীম-ﷺ-এর সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য কেবল নির্যাতন-নিপীড়ন এবং বিপদাপদের মধ্যেই সীমিত ছিল না, বরং পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রেও তিনি বড়ই ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর প্রতিপালক তাঁকে এর নির্দেশও দিয়েছেন। তাই তিনি আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে এমনভাবে পরিশ্রম করতেন যে, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর পা দু'টি ফুলে যেত। রোযা ও যিকর এবং অন্যান্য আরো ইবাদতসমূহ খুব বেশী বেশী করতেন। যখন তাঁকে (এত বেশী কেন করেন) এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বললেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?"

তাঁর বিষয়-বিতৃষ্ণা

কোনো কিছু লাভ করা সহজ হওয়া সত্ত্বেও অনাসক্তি প্রতদর্শন ক'রে যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকেই 'যুহদ' তথা বিষয়-বিতৃষ্ণা গুণে ভূষিত করা যায়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-মানুষের মধ্যে সব

চেয়ে বেশী দুনিয়ার প্রতি অনানুরক্ত ছিলেন এবং তার প্রতি তাঁর আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা কম ছিল। যা পেতেন, তা-ই যথেষ্ট মনে করতেন। তিনি তাঁর এই কঠিন জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। অথচ দুনিয়া ছিলো তাঁর সামনেই। আর তিনি হলেন আল্লাহর সৃষ্টির সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি চাইলে মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত অঢেল ধন-সম্পদ দান করতেন।

ইবনে কাসীর (রাহঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে খাইষামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম-ﷺ-কে বলা হল, যদি তুমি চাও তো যমীনের ধন-ভান্ডার ও তার চাবী তোমাকে দান করব, যা তোমার পূর্বে কোন নবীকে দান করেনি এবং তোমার পরেও কাউকে দান করবো না। আর এতে আল্লাহর নিকট তোমার জন্য যা সুরক্ষিত আছে, তা থেকেও কিছু কমবে না। তিনি-ﷺ-বললেন, "বরং তা আমাকে আখেরাতে দেওয়ার জন্য জমা রাখুন!" তাঁর জীবন ও জীবিকা ছিল বিস্ময়কর। আবূ যার-ﷺ-বলেন, আমি নবী করীম-ﷺ-এর সাথে মদীনার উত্তপ্ত প্রস্তরময় যমীনে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমাদের সামনে এল ওহুদ পাহাড়। তখন তিনি-ﷺ-বলেন,

((مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا، تَمْضِي عَلَيَّ ثَلاَثَة وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ)) وكان يقول: ((مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا

مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا))

“ওহুদ পাহাড় সমান সোনা আমার কাছে থাকলে আমি চাইবো না যে, তিনদিন অবধি তার এক দীনারও আমার কাছে থাকুক, কেবল ততটুকু পরিমাণ ছাড়া, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাখবো। আমি সমূহ সোনাকে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে ডান দিকে বাম দিকে ও পিছন দিকে এইভাবে এইভাবে বন্টন করে দিবো।” তিনি আরো বলেছেন,

((مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا))

“দুনিয়ার প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই এবং দুনিয়ারও আমার প্রতি কোনো ভালবাসা নেই। আমি দুনিয়ায় সেই আরোহীর মত, যে কোনো গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম ক’রে আবারও সে ছায়া ছেড়ে চলে যায়।”

তাঁর আহার ও পরিধান

তাঁর আহারের ব্যাপারটা হলো এই যে, কখনো এক মাস, দু’মাস ও তিনমাস তাঁর উপর দিয়ে এমন অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যেতো যে, তাঁর বাড়িতে (উনুনে) আগুন জ্বলত না। কেবল দু’টি কালো বস্তু অর্থাৎ, খেজুর ও পানিই হত তাঁর খাবার। কখনো ক্ষুধার কারণে পুরো দিন পেটের ব্যথায় ভুগতেন এবং পেটে ভরার মত কিছু পেতেন না।

তাঁর রুটি বেশীর ভাগই হত যবের। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কখনো নরম-মোলায়েম রুটি খাননি। বরং তাঁর খাদেম আনাস-ﷺ-এও উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে কখনোও রুটি ও গোশত সহ দুপুরের ও রাতের খাবার একত্রে বিদ্যমান থাকেনি, কেবল সেদিন ব্যতীত, যেদিন তার কাছে কোন অতিথি আসত।

পরিধানের ব্যাপারেও তাঁর অবস্থা উল্লিখিত অবস্থার থেকে কম ছিলো না। পরিধানের ব্যাপারেও তাঁর সাহাবীগণ তাঁর বিষয়-অনাসক্তি ও অনাড়ম্বরতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। অথচ অতীব মূল্যবান পোশাক পরার সামর্থ্য তাঁর ছিল। একজন সাহাবী তাঁর পোশাকের কথা বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে, কোন এক ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে এলাম, দেখলাম তিনি মোটা সুতির লুঙ্গি পরে বসে আছেন। আবূ বারদা-ﷺ-আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র কাছে প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে তালি দেওয়া একটি চাদর এবং মোটা একটি লুঙ্গি বের ক'রে দিয়ে বললেন, এই দু'টি পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মৃত্যুবরণ করেন। আনাস ইবনে মালিক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে যাচ্ছিলাম, তিনি পুরু পাড় বিশিষ্ট একটি নাজরানী চাদর (গায়ে) জড়িয়ে ছিলেন।'

মৃত্যুর সময় তিনি না রেখে গেছেন দীনার ও দিরহাম (টাকা-পয়সা), না কোন ক্রীতদাস-দাসী, আর না অন্য কোন কিছু, কেবল তাঁর সাদা খচ্চর, অস্ত্র এবং কিছু যমীন যা তিনি সাদক্বা করে গেছেন। আয়েশা

(রাযীআল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মৃত্যুর সময় আমার বাড়ির তাকে সামান্য যব ব্যতীত এমন কোনো জিনিস ছিল না, যা কোন প্রাণী খেতে পারে।' অনুরূপ মৃত্যুর সময় তাঁর বর্মটা একজন ইয়াহুদীর নিকট কিছু যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিলো। (বুখারী ২৯১৬)

তাঁর সুবিচার

তাঁর সুবিচার হলো, তিনি তাঁর গৌরবময় মহান প্রতিপালকের কার্য-কলাপে সুবিচার করেছেন। স্বীয় নাফসের সাথে আচরণে সুবিচার করেছেন। তাঁর স্ত্রীগণের এবং অন্যান্য সকল নিকটের ও দূরের, সাথী বা বন্ধুর, যে তাঁর পক্ষের এবং যে বিপক্ষের এমন কি যে তাঁর বড় শত্রু তার সাথেও তিনি সুবিচার করেছেন। কোনো জাতি তাঁর উপর অভিযোগ করেছে, কেউ তাঁর ব্যাপারে ভুল বুঝেছে, কিন্তু তিনি কোন সময় সুবিচার ত্যাগ করেননি। সুবিচার ছিলো রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর জীবনের সর্বাবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি সাহাবাগণ থেকে নিজের স্বতন্ত্রতা পছন্দ করতেন না, বরং তিনি ন্যায় ও সমতা ভাল বাসতেন। তাঁদের মত তিনিও কষ্ট-ক্লেশ ও ক্লান্তি সহ্য করতেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বদরের দিন আমাদের প্রত্যেক তিনজনের জন্য ছিলো একটি উট। আবূ লুবাবা এবং আলী ইবনে আবী তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথী। যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর (হাঁটার) পালা এলো, তাঁরা দু'জন বলল, আমরা হেঁটে যাই আপনি সওয়ারীর উপরেই থাকুন। তিনি-ﷺ-তখন বললেন,

((مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا))

"তোমরা আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী নও এবং আমি তোমাদের দু'জনের থেকে নেকীর মুখাপেক্ষী কম নই।"

একদা উসাই ইবনে হুযায়ের যখন সাথীদের সাথে ঠাট্টা করছিলেন এবং তাদেরকে হাসাচ্ছিলেন, তিনি একটি ছড়ি দিয়ে তাঁর কোমরে খোঁচা দিলেন। তখন উসায়েদ বললেন, আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন। এখন আমাকে আপনার থেকে বদলা নিতে দিন! তিনি বললেন, ঠিক আছে বদলা নাও। উসায়েদ বললেন, আপনার গায়ে জামা রয়েছে, আমার গায়ে জামা ছিলো না। তখন নবী করী-ﷺ-তাঁর জামাটা (পিঠ) থেকে উঠিয়ে নিলেন। তখন উসায়েদ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোমর ও পাঁজরের মাঝখানে চুমা দিতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এটাই চাচ্ছিলাম। (আবূ দাউদ ৫২২৪)

তিনি-ﷺ-মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত রাখার তাগিদে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ কর্তৃক দণ্ড-বিধি পরিহার করতে পছন্দ করতেন না, যদিও অপরাধী তাঁর কোনো আত্মীয় ও প্রিয়জন হতো, তাই তো মাখযুমী গোত্রের মহিলার চুরির ঘটনায় উসামার সুপারিশ গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো,

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ

مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্বের লোকেরা এই জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তাকে ছেড়ে দিত। (তার উপর আল্লাহর দণ্ড-বিধি কায়েম করত না) আর যখন কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তার উপর দণ্ড-বিধি কায়েম করতো। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের বেটি ফাতিমা চুরি করত, তাহলে আমি তাঁর হাতও কেটে দিতাম।"

মুহাম্মাদ-ﷺ-সম্পর্কে অভিমত

নিম্নে কোনো কোনো দার্শনিকের ও পাশ্চাত্যের প্রাচ্যজাগতিক ভাষা ও ধর্মীয় পন্ডিতদের নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-সম্পর্কে কথিত বক্তব্য থেকে কতিপয় বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে, এতে তাঁরা কোন পক্ষপাতিত্ব ও ইসলামের শত্রুদের প্রচার করা অসত্য উক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে এই মহান নবীর মাহাত্ম্য, তাঁর নবূওয়াত, তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং তাঁর আনীত দ্বীনের সততার স্বীকারুক্তি পরিষ্কারভাবে পেশ করেছেন।

ব্রিটেনের বার্নার্ডশো (Bernard Shaw) তার রচিত বই 'মুহাম্মাদ'এ লিখেছেন, (যে বইটি ব্রিটিশ সরকার জ্বালিয়ে দিয়েছে) বিশ্বের মুহাম্মাদের মত একজন চিন্তাবিদের অতীব প্রয়োজন। এই নবী তাঁর দ্বীনকে বড় সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থানে রেখেছেন। কারণ, ইসলামই এমন বৃহত্তর ধর্ম, যা সকল সভ্যতার চিরকালীন পরিবর্তন এনেছে। আমি আমার

জাতির অনেককে দেখেছি যে, তারা জ্ঞানের আলোকে এই দ্বীনে প্রবেশ করেছে। আর এই দ্বীন ইউরোপ মহাদেশে বড় বিস্তার লাভ করবে। তিনি বলেন, মধ্য যুগের ধর্মের পন্ডিতরা মুর্খতা অথবা পক্ষ-পাতিত্বের বশবর্তী হয়ে মুহাম্মাদের দ্বীনকে কু-শ্রীরূপে চিত্রিত করেছে। তারা তাঁকে খ্রীষ্টধর্মের শত্রু মনে করত। কিন্তু আমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে পড়ে বড় বিস্ময়কর ও অলৌকিক জিনিস পেয়েছি এবং এই পরিণামে পৌঁচেছি যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মের শত্রু ছিলেন না, বরং তাঁকে মানবতার মুক্তিদাতা আখ্যা দেওয়া আবশ্যক। আর আমার মতে তিনি যদি আজ বিশ্বের নেতৃত্ব দিতেন, তাহলে আমাদের সমূহ সমস্যার সমাধান হয়ে যেত এবং সেই শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত, যার প্রতি মানুষ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে।

স্কটলেন্ডের নভেল পুরস্কার লাভকারী টমাস কারলাইল (Tomas Carle) তার কিতাব 'বীর'এ বলেছেন, বর্তমান যুগের প্রত্যেক মানুষের সব চেয়ে বড় দোষ হল এই কথার প্রতি কান দেওয়া যে, ইসলাম একটি মিথ্যা ধর্ম এবং মুহাম্মাদ একজন প্রতারক ও মিথ্যুক। আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হলে, এই ধরনের অসংগত ও লজ্জাকর কথাসমূহের প্রচার-প্রসারের বিরুদ্ধে রোখে দাঁড়ানো। কারণ, এই রাসূল যে বার্তা ও পায়গাম পেশ করেছেন, তা প্রায় কুড়ি কোটি মানুষের জন্য ১২ শতাব্দি কাল ধরে উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে রয়েছে। (তবে এ হিসাব নবূওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে টমাসের বই লেখার যুগ পর্যন্ত) তোমাদের কেউ

কি মনে করতে পারে যে, এই পয়গম্বরের বার্তা ও পায়গাম যার উপর অসংখ্য মানুষ জীবন-যাপন করলো ও মৃত্যুবরণ করলো, তা সবই মিথ্যা ও প্রতারণা?

হিন্দু দার্শনিক রামকৃষ্ণ রাও লিখেছেন, মুহাম্মাদের আবির্ভাবের সময় আরব দ্বীপ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। এই মরুভূমি থেকে যেখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না, মুহাম্মাদ তাঁর মহান আত্মার দ্বারা সমর্থ হয়েছেন নতুন বিশ্ব, নতুন জীবন, নতুন সংস্কৃতি, নতুন সভ্যতা এবং এমন নতুন দেশ গঠন করতে, যা মারাকেশ (মরক্কো একটি শহর) থেকে ভারত উপ-মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের মত তিনটে মহাদেশের জীবন ধারা ও চিন্তা-চেতনায় প্রভাব ফেলতেও সক্ষম হয়েছেন।

কানাডার প্রাচ্যজাগতিক ভাষা ও ধর্মের পন্ডিত জুয়েমার (Zweimer) বলেন, নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ সর্বাপেক্ষা মহান ধর্ম-নেতা ছিলেন। তাঁর ব্যাপারেই এ কথা যথাযথ যে, তিনি সমর্থ-সক্ষম সংস্কারক, শুদ্ধভাষী ও বাক্যালাপে পারদর্শী, নির্ভীক বীর এবং মহান চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁকে (উল্লিখিত) এই গুণগুলির পরিপন্থী গুণে আখ্যায়িত করা বৈধ নয়। তাঁর আনীত এই কুরআন এবং তাঁর ইতিহাস এই দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

জনাব উইলিয়াম মুয়ার (William Muir) বলেছেন, মুসলিমদের নবী মুহাম্মাদ তাঁর দেশবাসীর ঐক্যমতে শিশুকাল থেকেই স্বীয় উচ্চ নৈতিকতা

ও উত্তম ব্যবহারের কারণে 'আল-আমীন' (আমানতদার) উপাধি লাভ করেছিলেন। সেখানে (তাঁর সাথে) যা কিছু হয়ে থাকুক না কেন, তিনি বর্ণনাকারীর বর্ণনার অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সম্মান বুঝতে পারবে না। আর তাঁর ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সেই গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করেন, যে ইতিহাস মুহাম্মাদকে বিশ্বের নবীদের মধ্যে এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে শীর্ষস্থান দান করেছে। তিনি বলেন, এটাও মুহাম্মাদের পৃথক এক বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর বাক্য শুদ্ধ-পরিষ্কার এবং তাঁর দ্বীন সহজ। তিনি এমন কর্মসমূহ সম্পাদন করেছেন, যা বিবেক-বুদ্ধিকে বিস্মিত করে দেয়। ইতিহাস এমন সংস্কারককে জানতে সক্ষম হয়নি, যে ঐভাবে মানুষের মাঝে জাগরণ আনতে পেরেছে, সচ্চরিত্রতাকে জীবিত করতে পেরেছে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে নৈতিকতার মান সমুন্নত করতে পেরেছে, যেভাবে ইসলামের নবী মুহাম্মাদ পেরেছেন।

রাশিয়ার মহান উপন্যাসিক ও দার্শনিক লিও টোলসটয় (Leo tolstoy) বলেছেন, মুহাম্মাদের গৌরবের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি জঘন্য নিষ্ঠুর জাতিকে শয়তানের নিকৃষ্টতম কুঅভ্যাস ও কুকর্মের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করেছেন এবং তাদের সামনে উন্নতি ও অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অবশ্যই মুহাম্মদের শরীয়ত সারা পৃথিবীতে ছেয়ে যাবে। কারণ, তা জ্ঞান ও যুক্তির সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

অস্ট্রিয়া (Austria) বলেন, মানবতা মুহাম্মাদের মত একজন মানুষের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গর্ববোধ করে। কারণ, তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও প্রায়১৪ শতাব্দির পূর্বে এমন বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন যে, আমরা ইউরোপীয়রা সর্বাধিক ভাগ্যবান হতে পারতাম, যদি আমরা সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারতাম, যে উচ্চতায় তিনি পৌঁছেছিলেন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	নবী আসার পূর্বে আরবের অবস্থা
৪	ইবনুযযাবিহাঈন
৬	হস্তী বাহিনীর ঘটনা
৭	নবী করীম-ﷺ-এর দুধ পান
৯	তাঁর বক্ষ বিদারণ
১৩	নবূওয়াত লাভ
১৫	প্রকাশ্য দাওয়াত
১৮	হাবশায় হিজরাত
২১	দুঃখের বছর
২২	রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তায়েফে
২৩	চন্দ্রের দু'টুকরো হওয়া
২৩	ইসরা ও মিরাজ
২৬	মদীনায় হিজরত
৩০	রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মদীনায়
৩১	বদরের যুদ্ধ
৩৩	ওহুদের যুদ্ধ
৩৩	খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ
৩৪	মক্কা বিজয়
৩৫	প্রতিনিধি দলের আগন এবং বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণ
৩৬	রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মৃত্যু
৩৭	নবী করীম-ﷺ-এর সৃষ্টিগত গুণ

৩৮	রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর চরিত্র
৪০	তাঁর কতিপয় মু'জেযা
৪৩	রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর জীবনী থেকে সংগৃহীত উপদেশাবলী
৪৩	তাঁর রসিকতা
৪৪	ছোটদের সাথে তাঁর আচরণ
৪৬	স্বীয় পরিবারবর্গের সাথে তাঁর আচরণ
৪৭	তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য
৪৮	তাঁর সহিষ্ণুতা
৫৩	তাঁর বিষয়-বিতৃষ্ণা
৫৫	তাঁর আহার ও পরিধান
৫৭	তাঁর সুবিচার
৫৯	মুহাম্মাদ-ﷺ-সম্পর্কে অভিমত